ছায়াপথের রূপকথা

(লাফ্‌কাডিও হার্ণ)

বাগীশবন্ধু মুৎসুদ্দি

সাহিত্যিক ও সাংবাদিব

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

ছায়াপথের রূপকথা

প্রাচীন জাপানে অনেক সুন্দর সুন্দর উৎসব অনুষ্ঠিত হোত। তার মধ্যে কিন্তু সব চেয়ে মনোরম ছিল ছায়াপথের বয়নরতা মেয়ে তানাবাতা শুমের উৎসব। আজকাল অবশ্য বড় বড় শহরে এই উৎসব বিশেষ দেখা যায় না। রাজধানী টোকিও তো এই অনুষ্ঠানের কথা ভুলেই গেছে। কিন্তু মফঃস্বলের অনেক জেলায় এবং টোকিওর নিকটবর্তী অনেক গ্রামেও তানাবাতা শুমের উপাখ্যান-স্মারক উৎসবটি এখনো সাধারণভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে সকল শহর বা গ্রামে প্রাচীন প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলো অপ্রচলিত হয়ে যায় নি সেখানে এই পর্বদিনটি এখনো মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। প্রাচীন পঞ্জিকার হিসেবে সপ্তম মাসের সপ্তম দিন হোল এই উৎসবের দিন। এই দিনটিতে সেকেলে শহর ও গ্রামগুলোতে গেলে দেখা যায়, বহু বাড়ীর ছাদে বা উঠোনে সদ্যকাটা বাঁশ পোঁতা রয়েছে, আর প্রত্যেক বাঁশে ঝোলানো রয়েছে অনেকগুলো রঙীন কাগজ। প্রথা অনুযায়ী উৎসবের এই কাগজগুলো পাঁচ বা সাত রঙের হয়। তবে কোন কোন গরীব গ্রামে কাগজগুলো সাদা অথবা এক রঙেরও দেখা যায়। প্রত্যেক কাগজে তানাবাতা বা তার স্বামী
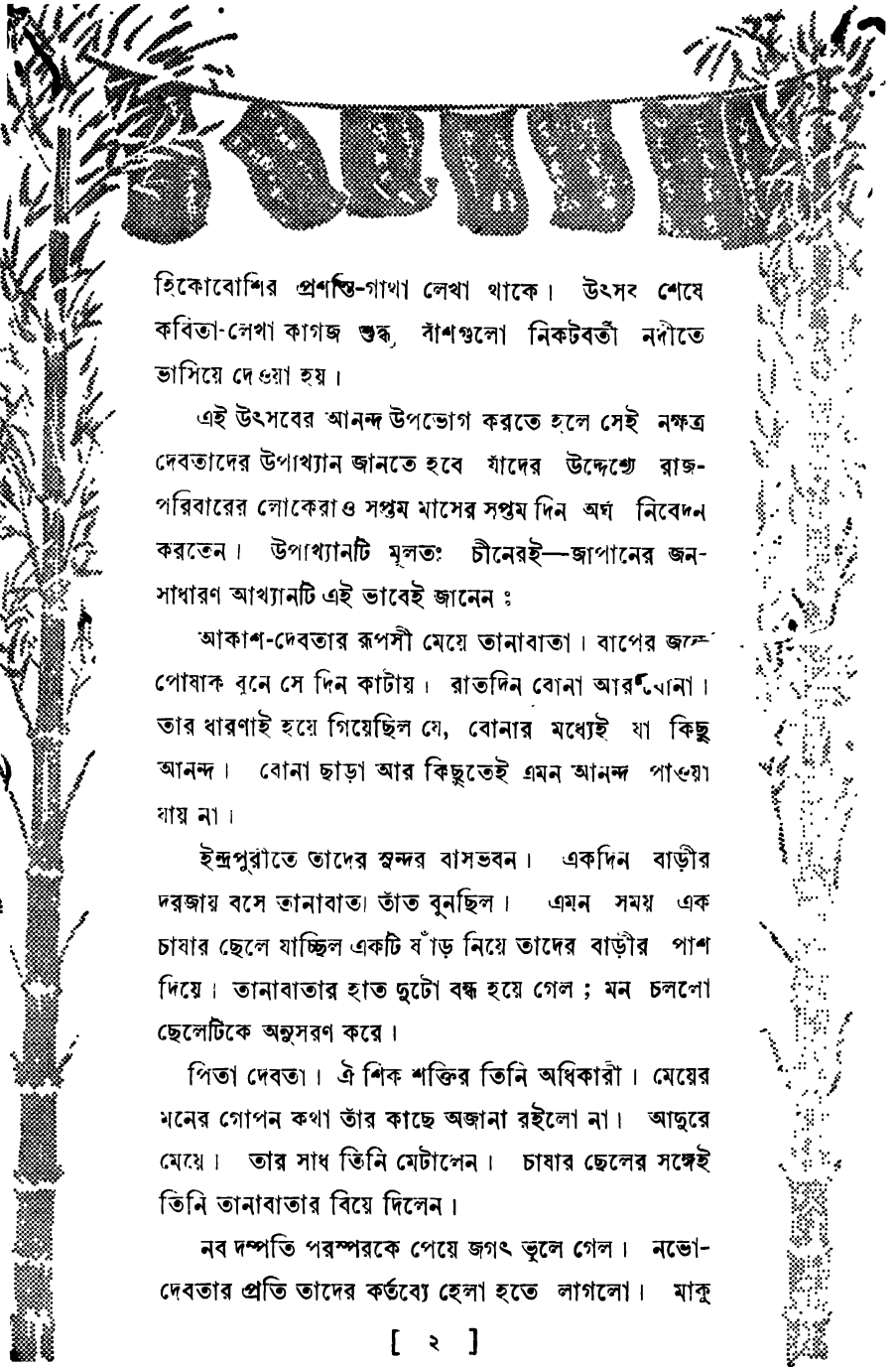
হিকোবোশির প্রশস্তি-গাথা লেখা থাকে। উৎসব শেষে কবিতা-লেখা কাগজ শুদ্ধ, বাঁশগুলো নিকটবর্তী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।
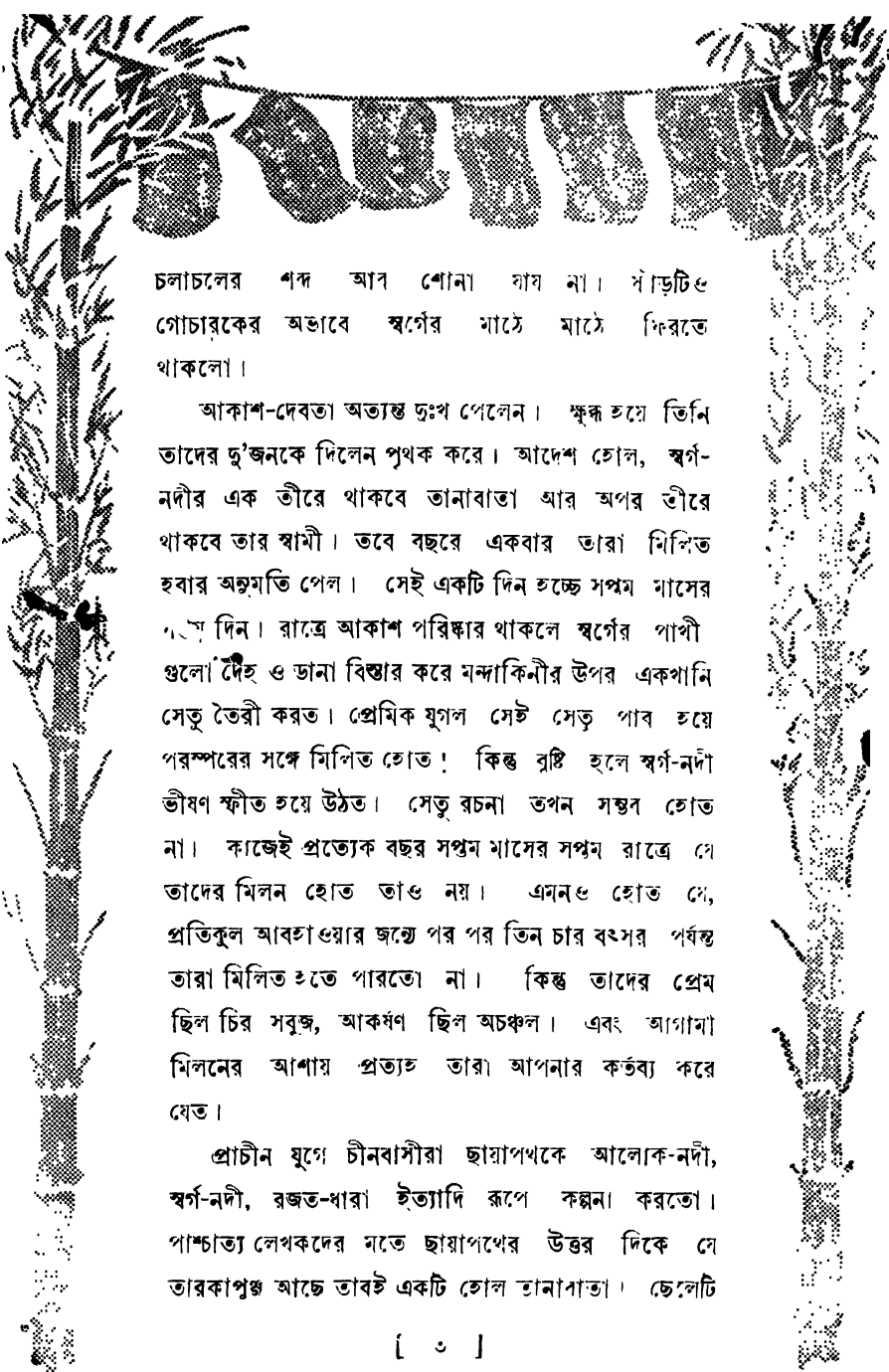
এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে হলে সেই নক্ষত্র দেবতাদের উপাখ্যান জানতে হবে যাঁদের উদ্দেশ্যে রাজ-পরিবারের লোকেরাও সপ্তম মাসের সপ্তম দিন অর্ঘ নিবেদন করতেন। উপাখ্যানটি মূলতঃ চীনেরই—জাপানের জন-সাধারণ আখ্যানটি এই ভাবেই জানেন ঃ

আকাশ-দেবতার রূপসী মেয়ে তানাবাতা। বাপের জন্যে পোষাক বুনে সে দিন কাটায়। রাতদিন বোনা আর বোনা। তার ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে, বোনার মধ্যেই যা কিছু আনন্দ। বোনা ছাড়া আর কিছুতেই এমন আনন্দ পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রপুরীতে তাদের সুন্দর বাসভবন। একদিন বাড়ীর দরজায় বসে তানাবাতা তাঁত বুনছিল। এমন সময় এক চাষার ছেলে যাচ্ছিল একটি ষাঁড় নিয়ে তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে। তানাবাতার হাত দুটো বন্ধ হয়ে গেল ; মন চললো ছেলেটিকে অনুসরণ করে।

পিতা দেবতা। ঐশিক শক্তির তিনি অধিকারী। মেয়ের মনের গোপন কথা তাঁর কাছে অজানা রইলো না। আদুরে মেয়ে। তার সাধ তিনি মেটালেন। চাষার ছেলের সঙ্গেই তিনি তানাবাতার বিয়ে দিলেন।
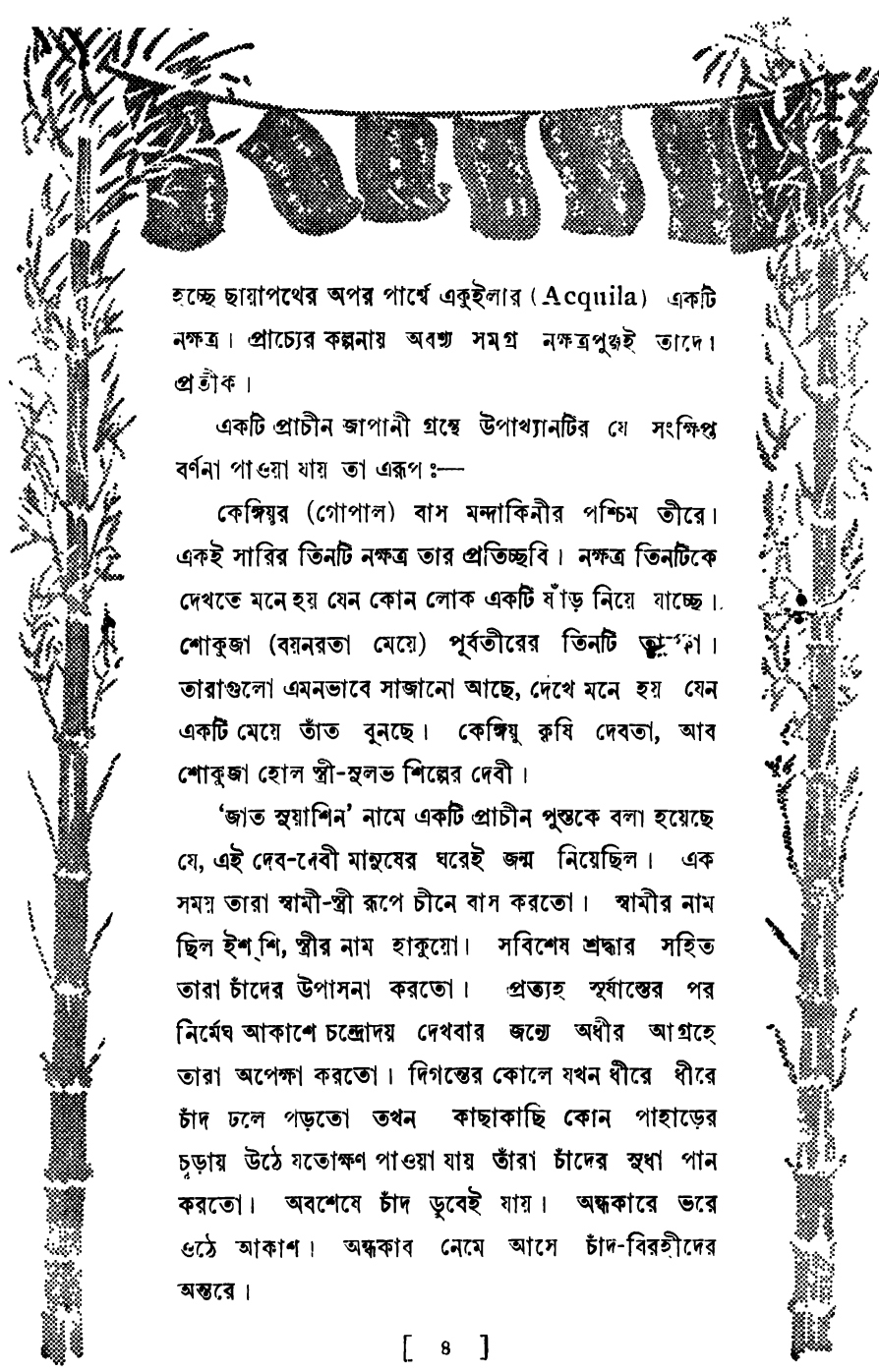
নব দম্পতি পরস্পরকে পেয়ে জগৎ ভুলে গেল। নভো-দেবতার প্রতি তাদের কর্তব্যে হেলা হতে লাগলো। মাকু

চলাচলের শব্দ আর শোনা যায় না। ষাঁড়টিও গোচারকের অভাবে স্বর্গের মাঠে মাঠে ফিরতে থাকলো।

আকাশ-দেবতা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাদের দু'জনকে দিলেন পৃথক করে। আদেশ হোল, স্বর্গ-নদীর এক তীরে থাকবে তানাবাতা আর অপর তীরে থাকবে তার স্বামী। তবে বছরে একবার তারা মিলিত হবার অনুমতি পেল। সেই একটি দিন হচ্ছে সপ্তম মাসের সপ্তম দিন। রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকলে স্বর্গের পাখী গুলো দেহ ও ডানা বিস্তার করে মন্দাকিনীর উপর একখানি সেতু তৈরী করত। প্রেমিক যুগল সেই সেতু পার হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হোত! কিন্তু বৃষ্টি হলে স্বর্গ-নদী ভীষণ স্ফীত হয়ে উঠত। সেতু রচনা তখন সম্ভব হোত না। কাজেই প্রত্যেক বছর সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রে যে তাদের মিলন হোত তাও নয়। এমনও হোত যে, প্রতিকুল আবহাওয়ার জন্যে পর পর তিন চার বৎসর পর্যন্ত তারা মিলিত হতে পারতো না। কিন্তু তাদের প্রেম ছিল চির সবুজ, আকর্ষণ ছিল অচঞ্চল। এবং আগামী মিলনের আশায় প্রত্যহ তারা আপনার কর্তব্য করে যেত।

প্রাচীন যুগে চীনবাসীরা ছায়াপথকে আলোক-নদী, স্বর্গ-নদী, রজত-ধারা ইত্যাদি রূপে কল্পনা করতো। পাশ্চাত্য লেখকদের মতে ছায়াপথের উত্তর দিকে যে তারকাপুঞ্জ আছে তারই একটি হোল তানাবাতা। ছেলেটি

হচ্ছে ছায়াপথের অপর পার্শ্বে একুইলার (Acquila) একটি নক্ষত্র। প্রাচ্যের কল্পনায় অবশ্য সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জই তাদের প্রতীক।

একটি প্রাচীন জাপানী গ্রন্থে উপাখ্যানটির যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় তা এরূপ :—
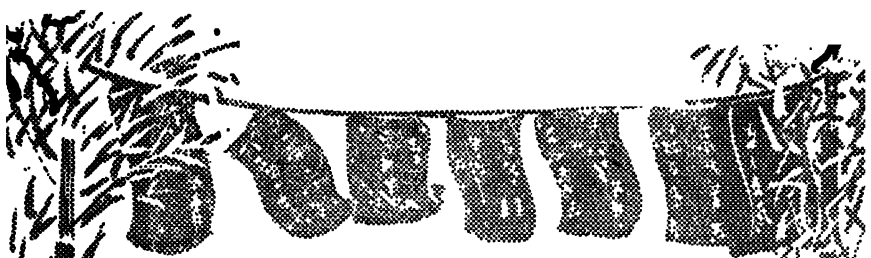
কেঙ্গিয়ুর (গোপাল) বাস মন্দাকিনীর পশ্চিম তীরে। একই সারির তিনটি নক্ষত্র তার প্রতিচ্ছবি। নক্ষত্র তিনটিকে দেখতে মনে হয় যেন কোন লোক একটি ষাঁড় নিয়ে যাচ্ছে। শোকুজা (বয়নরতা মেয়ে) পূর্বতীরের তিনটি তারা। তারাগুলো এমনভাবে সাজানো আছে, দেখে মনে হয় যেন একটি মেয়ে তাঁত বুনছে। কেঙ্গিয়ু কৃষি দেবতা, আর শোকুজা হোল স্ত্রী-সুলভ শিল্পের দেবী।

'জাত সুয়াশিন' নামে একটি প্রাচীন পুস্তকে বলা হয়েছে যে, এই দেব-দেবী মানুষের ঘরেই জন্ম নিয়েছিল। এক সময় তারা স্বামী-স্ত্রী রূপে চীনে বাস করতো। স্বামীর নাম ছিল ইশ্‌শি, স্ত্রীর নাম হাকুয়ো। সবিশেষ শ্রদ্ধার সহিত তারা চাঁদের উপাসনা করতো। প্রত্যহ সূর্যাস্তের পর নির্মেঘ আকাশে চন্দ্রোদয় দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করতো। দিগন্তের কোলে যখন ধীরে ধীরে চাঁদ ঢলে পড়তো তখন কাছাকাছি কোন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যতোক্ষণ পাওয়া যায় তাঁরা চাঁদের সুধা পান করতো। অবশেষে চাঁদ ডুবেই যায়। অন্ধকারে ভরে ওঠে আকাশ। অন্ধকার নেমে আসে চাঁদ-বিরহীদের অন্তরে।

নিরনব্বই বৎসর বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। হাঁড়িচাচা পাখীর ডানায় ভর করে তার আত্মা স্বর্গে চলে যায়। সেখানে একটি তারকায় সে রূপ পরিগ্রহ করে। ঈশ্‌শির বয়স তখন একশো তিন। সুধাকরের শীতল প্রীতিতে বৃদ্ধ তার শোক ভুলতে চেষ্টা করে। চাঁদের আলোকে সে স্বাগত সম্ভাষণ জানায়, চাঁদ ডুবে গেলে শোকে ম্রিয়মাণ হয়। এবং সে মনে করে, তার স্ত্রীও বুঝি পাশে থেকে তার মতো চন্দ্রোদয়ে উল্লাস আর চন্দ্র অস্তমিত হলে দুঃখ প্রকাশ করছে।
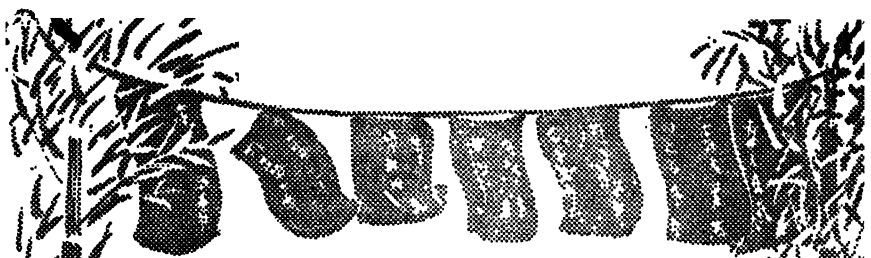
স্বর্গে গিয়ে হাকুয়ো চিরযৌবন ও চিরলাবণ্য লাভ করে। নিদাঘের এক রাত্রে হাঁড়িচাচার পাখায় ভর করে হাকুয়ো তার স্বামীকে দেখবার জন্যে মর্ত্যে নেমে আসে। স্ত্রীকে দেখে বৃদ্ধের খুব আহ্লাদ হয়। কিন্তু কতোক্ষণেরই বা আনন্দ! হাকুয়োকে ফিরে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু তখন থেকে বৃদ্ধের একমাত্র ভাবনা হোল, কেমন করে সে তারকার জীবন লাভ করবে, কেমন করে সে স্বর্গের নদী পার হবে, মিলিত হবে তার প্রিয়তমা হাকুয়োর সঙ্গে।

অবশেষে সেদিনও এল। একটি কাকের পিঠে চড়ে ঈশ্‌শি আকাশে চলে গেল। সেখানে এক নক্ষত্র দেবতায় সে রূপ গ্রহণ করলো। কিন্তু যেমন আশা করেছিল তা হোল না। স্বর্গে গিয়েই সে হাকুয়োর সঙ্গে মিলিত হতে পারলো না। কারণ তার ও তার স্ত্রীর নির্দিষ্ট স্থানকে বিভক্ত করে বয়ে গেছে স্বর্গের নদী মন্দাকিনী। দেবরাজ (তেন-তেই) সেই নদীতে স্নান করেন বলে নদী পার হবার অনুমতি তাদের দেওয়া হোল

না। তাছাড়া এই নদীর ওপর কোন সেতুও নেই। তবে সপ্তম মাসের সপ্তম দিন তারা মিলিত হবার অনুমতি পেল। সেদিন স্বর্গাধিপতি বুদ্ধের দেশনা শোনবার জন্যে 'জেনহোডোতে' যান। এদিকে হাঁড়িচাচা ও দাঁড়কাকগুলো তাদের উড়ন্ত দেহ ও ডানা প্রসারিত করে একখানা সেতু তৈরি করে। হাকুয়ো সেই সেতু পার হয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়!

জাপানের 'তানাবাতা' উৎসব আর চীনের বয়নদেবী 'ছি-নিউ'-এর উৎসব আদতে এক সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মনে হয়, প্রাচীন কাল থেকে জাপানের এই পর্বদিন বিশেষ করে মেয়েদের পর্বদিন রূপে প্রচলিত। তানাবাতা শব্দটির হরফগুলো দেখতে একটি বয়নরতা মেয়ের মতো দেখায়। কিন্তু দুই তারকাদেবীর উৎসব একই দিনে (সপ্তম মাসের সপ্তম দিন) হওয়ায় কোন কোন জাপানী পণ্ডিত 'তানাবাতা' নামের প্রচলিত ব্যাখ্যা নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বলেন, মূলতঃ 'তানাবাতা' শব্দটি 'তানে' (বীজ বা শস্য) এবং 'হাতা' (তাঁত) এই দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তাঁদের মতে শব্দটি এক বচন নয়; বহু বচন; এবং মানে হোল 'শস্যদেবীরা বা তন্তুদেবীরা অর্থাৎ যে সকল দেবীর কৃষি বা বয়ন-শিল্পের উপর আধিপত্য আছে। প্রাচীন জাপানী চিত্রে এই তারকা দেবদেবীকে তাদের স্ব স্ব বিশেষ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে— হিকোবোশি ষাঁড়কে জল খাওয়াবার জন্যে স্বর্গনদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর অন্য তীরে ওরিহিমে (তানাবাতা)

তাঁত বুনছে। উভয়ের পোষাক চীন দেশীয়। মনে হয়, চীনের কোন মূল ছবি অনুসরণ করে জাপানে এই দেব-দেবীর প্রথম ছবিগুলো আঁকা হয়েছিল।

জাপানের প্রাচীনতম কাব্য সংগ্রহ 'মানিওশু'-তে (৭৬০ খৃঃ) দেবতাকে হিকোবোশি এবং দেবীকে তানাবাতা-শুমে নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে উভয়েই 'তানাবাতা' নামে অভিহিত হয়েছিল। ইজুমু প্রদেশে দেবতা 'ও-তানাবাতা শুমে' এবং দেবী 'মে-তানাবাতা শুমে' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। এখনো উভয়ের অনেক নাম প্রচলিত। দেবতার 'কায়বোশি', হিকোবোশি এবং 'কেঙ্গিয়ূ' নাম, আর দেবীর 'আসাগাও হিমে (প্রভাত-গৌরবা রাজকন্যা), ইতো-ওরি-হিমে (বয়নরতা রাজকন্যা), মোমোকো হিমে (পিচবর্ণা রাজকন্যা), তাকিমোনো-হিমে (সুবাসিতা রাজকন্যা) সসাগনি হিমে (ঊর্ণনাভ রাজকন্যা) প্রভৃতি নাম প্রচলিত।

চীন-সম্রাট মিঙহঙের (জাপানী নাম গেনসো) সময়ে রাজপুরনারীদের মধ্যে এক মজার প্রথা প্রচলিত ছিল। সপ্তম মাসের সপ্তম দিন তাঁরা সকলে মাকড়সা ধরতেন। ধূপ-সুরভিত বাক্সে সেগুলো পুরে রাখা হোত! অষ্টম দিন সকাল বেলা বাক্সগুলো খোলা হোত। যাঁর মাকড়সা ঘন জাল বুনেছে তাঁদের ধারণা ছিল, সে বছর তাঁর ভালই কাটবে। আর যাঁর মাকড়সা অলসভাবে বসে আছে তাঁর ভাগ্য সেবার মন্দ বলেই তাঁরা মনে করতেন।
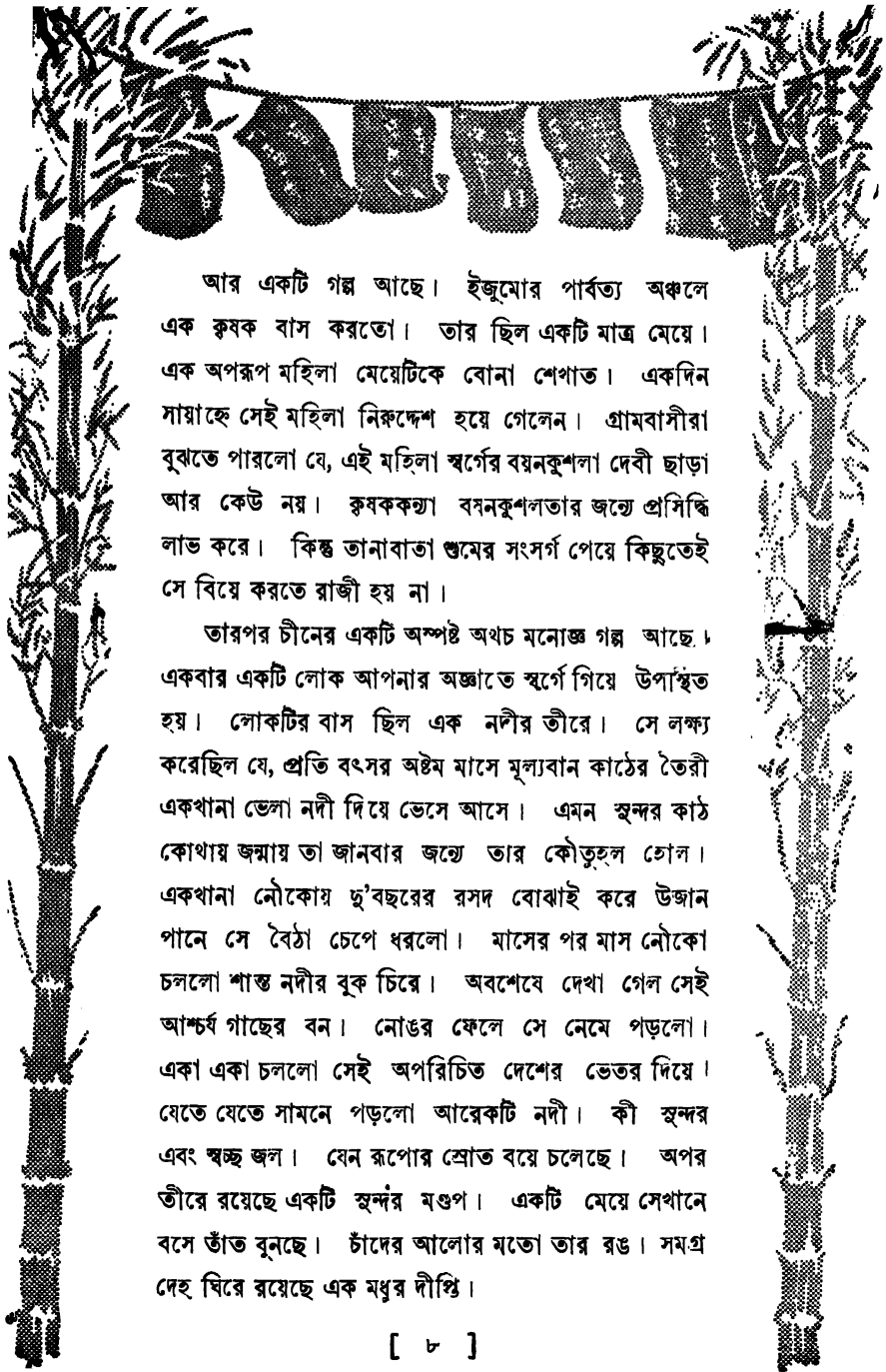
আর একটি গল্প আছে। ইজুমোর পার্বত্য অঞ্চলে এক কৃষক বাস করতো। তার ছিল একটি মাত্র মেয়ে। এক অপরূপ মহিলা মেয়েটিকে বোনা শেখাত। একদিন সায়াহ্নে সেই মহিলা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারলো যে, এই মহিলা স্বর্গের বয়নকুশলা দেবী ছাড়া আর কেউ নয়। কৃষককন্যা বয়নকুশলতার জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু তানাবাতা শুমের সংসর্গ পেয়ে কিছুতেই সে বিয়ে করতে রাজী হয় না।
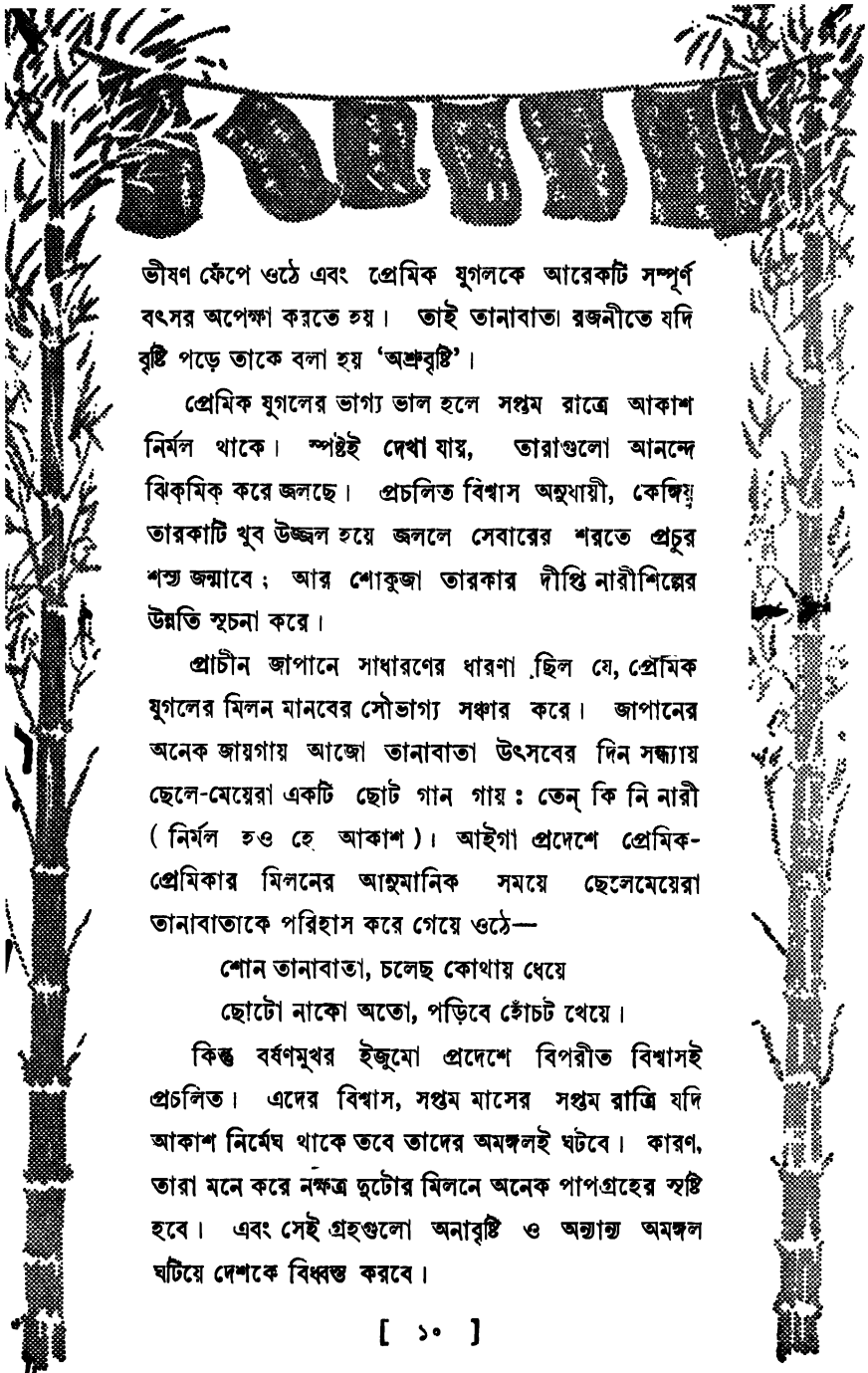
তারপর চীনের একটি অস্পষ্ট অথচ মনোজ্ঞ গল্প আছে। একবার একটি লোক আপনার অজ্ঞাতে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়। লোকটির বাস ছিল এক নদীর তীরে। সে লক্ষ্য করেছিল যে, প্রতি বৎসর অষ্টম মাসে মূল্যবান কাঠের তৈরী একখানা ভেলা নদী দিয়ে ভেসে আসে। এমন সুন্দর কাঠ কোথায় জন্মায় তা জানবার জন্যে তার কৌতূহল হোল। একখানা নৌকোয় দু'বছরের রসদ বোঝাই করে উজান পানে সে বৈঠা চেপে ধরলো। মাসের পর মাস নৌকো চললো শান্ত নদীর বুক চিরে। অবশেষে দেখা গেল সেই আশ্চর্য গাছের বন। নোঙর ফেলে সে নেমে পড়লো। একা একা চললো সেই অপরিচিত দেশের ভেতর দিয়ে। যেতে যেতে সামনে পড়লো আরেকটি নদী। কী সুন্দর এবং স্বচ্ছ জল। যেন রূপোর স্রোত বয়ে চলেছে। অপর তীরে রয়েছে একটি সুন্দর মণ্ডপ। একটি মেয়ে সেখানে বসে তাঁত বুনছে। চাঁদের আলোর মতো তার রঙ। সমগ্র দেহ ঘিরে রয়েছে এক মধুর দীপ্তি।
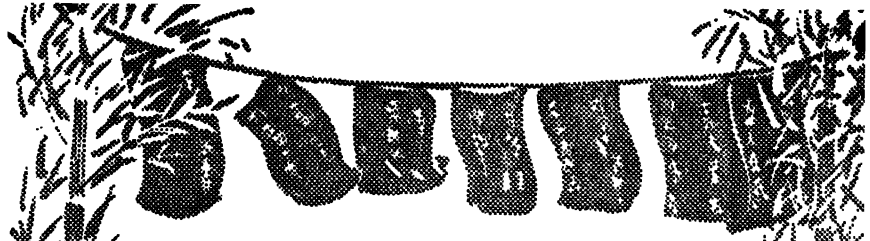
সেই মুহূর্তে সেখানে আরেকটি সুন্দর কৃষক যুবকের আবির্ভাব হোল। একটি ষাঁড় নিয়ে সে নদীর দিকে আসছিল। লোকটি যুবকটিকে সেই দেশের নাম জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু যুবকটি যেন এই প্রশ্নে বিরক্ত হোল। কর্কশ স্বরে সে জবাব দিল, "যেখানে থেকে এসেছ সেখানে ফিরে গিয়ে গেন্-কুম্-পেইকে জিজ্ঞেস করোগে।" লোকটি ভয় পেল। তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠে এসে চীনের দিকে সে হাল ধরলো। ফিরে এসে ঋষি গেন্-কুম্-পেইকে সে খুঁজে বার করলো। সমস্ত ঘটনা শুনে ঋষি হাততালি দিয়ে উঠলেন। বললেন, "তা'হলে সে তুমিই!···সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে আমি আকাশের দিকে চেয়ে ছিলুম। দেখলুম গোপালের সঙ্গে মেয়েটির মিলন যখন প্রায় ঘটে উঠেছে তখন তাদের মাঝখানে আরেকটি নতুন তারার আবির্ভাব হোল। আমি ভাবলুম, ওটা কোন অতিথি তারকা হবে। বাঃ বেশ ভাগ্যবান লোক তো তুমি! তুমি স্বর্গনদীর তীরে গিয়ে বয়নকুশলা মেয়েটিকে দেখে এসেছ।"

প্রবাদ আছে, যুবকটির সঙ্গে বয়নশিল্পী মেয়েটির মিলন যে কোন ভাল দৃষ্টিসম্পন্ন লোক মর্ত্যে বসে দেখতে পারে। কারণ তাদের মিলন-ক্ষণে তারাগুলো পাঁচ রঙের দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলে ওঠে। এই জন্যেই তানাবাতা দেবীকে পাঁচ রঙের উপচার উৎসর্গ করা হয়—তাঁদের গুণ-গাথা লেখা হয় পাঁচ রঙের কাগজে।

আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভাল থাকলে তবেই শুধু তাঁদের মিলন সম্ভব হোত। সামান্য বৃষ্টিপাত হলেও স্বর্গনদীর জল

ভীষণ কেঁপে ওঠে এবং প্রেমিক যুগলকে আরেকটি সম্পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। তাই তানাবাতা রজনীতে যদি বৃষ্টি পড়ে তাকে বলা হয় 'অশ্রুবৃষ্টি'।
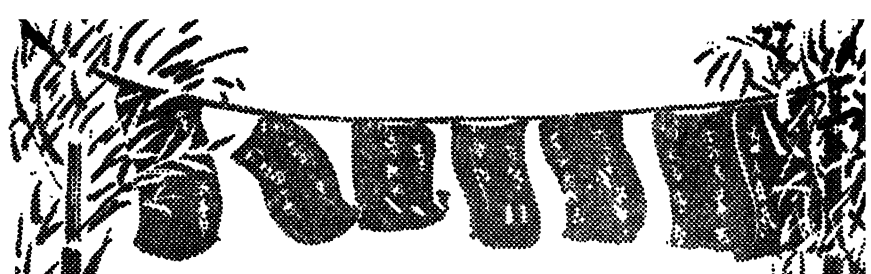
প্রেমিক যুগলের ভাগ্য ভাল হলে সপ্তম রাত্রে আকাশ নির্মল থাকে। স্পষ্টই দেখা যায়, তারাগুলো আনন্দে ঝিকৃমিক্ করে জ্বলছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, কেঙ্গিয়ু তারকাটি খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বললে সেবারের শরতে প্রচুর শস্য জন্মাবে; আর শোকুজো তারকার দীপ্তি নারীশিল্পের উন্নতি সূচনা করে।

প্রাচীন জাপানে সাধারণের ধারণা ছিল যে, প্রেমিক যুগলের মিলন মানবের সৌভাগ্য সঞ্চার করে। জাপানের অনেক জায়গায় আজো তানাবাতা উৎসবের দিন সন্ধ্যায় ছেলে-মেয়েরা একটি ছোট গান গায়: তেন্ কি নি নারী (নির্মল হও হে আকাশ)। আইগা প্রদেশে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের আনুমানিক সময়ে ছেলেমেয়েরা তানাবাতাকে পরিহাস করে গেয়ে ওঠে—

> শোন তানাবাতা, চলেছ কোথায় ধেয়ে
> ছোটো নাকো অতো, পড়িবে হোঁচট খেয়ে।

কিন্তু বর্ষণমুখর ইজুমো প্রদেশে বিপরীত বিশ্বাসই প্রচলিত। এদের বিশ্বাস, সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রি যদি আকাশ নির্মেঘ থাকে তবে তাদের অমঙ্গলই ঘটবে। কারণ, তারা মনে করে নক্ষত্র দুটোর মিলনে অনেক পাপগ্রহের সৃষ্টি হবে। এবং সেই গ্রহগুলো অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য অমঙ্গল ঘটিয়ে দেশকে বিধ্বস্ত করবে।

চীনের প্রথা অনুসরণ করে বোধ হয় ১১৫০ বৎসর পূর্বে জাপানের রাজপরিবারের মধ্যে প্রথম তানাবাতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরে অভিজাত ও যোদ্ধৃপরিবার সমূহ রাজকীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। ক্রমে ক্রমে এই উৎসব (জাপানে হোশিমাৎস্থরি উৎসব নামে পরিচিত) ব্যাপক প্রচার লাভ করে। বস্তুত পক্ষে সপ্তম মাসের সপ্তম দিন সম্পূর্ণরূপে জাতীয় পর্বদিনে পরিণত হয়। তবে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন প্রদেশে এই উৎসব বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজপ্রাসাদে এই উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হোত। প্রাসাদের পূর্বদিকে মাদুর পেতে তার ওপর চার-খানা ছোট চৌকি রাখা হোত। চৌকির উপর সাজানো থাকতো নক্ষত্র দেবতাদের অর্ঘ। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আহার্য উপচার ছাড়া ধেনোমদ, ধুপ, গালার লাল ফুলদানীতে ফুল, একটি বীণা ও বাঁশী এবং পাঁচ রঙের সুতো পরানো একটি পাঁচ ছিদ্রওয়ালা সুঁচ চৌকির ওপর সাজিয়ে দেওয়া হোত। অর্ঘসম্ভার উজ্জল দেখাবার জন্যে চৌকির পাশে কালো গালার তৈল প্রদীপ জলতো! উৎসব স্থানের এক পাশে এমনভাবে একটি জলের গামলা বসানো হোত যেন সেখানে তানাবাতা তারকার আলোটি পড়তে পারে। রাজপুরনারীরা সেই জলে প্রতিফলিত আলোয় একটি সুঁচে সুতো পরাবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, যিনি সুতো পরাতে পারতেন সে বছর তাঁর ভাগ্য ভালো যাবে।
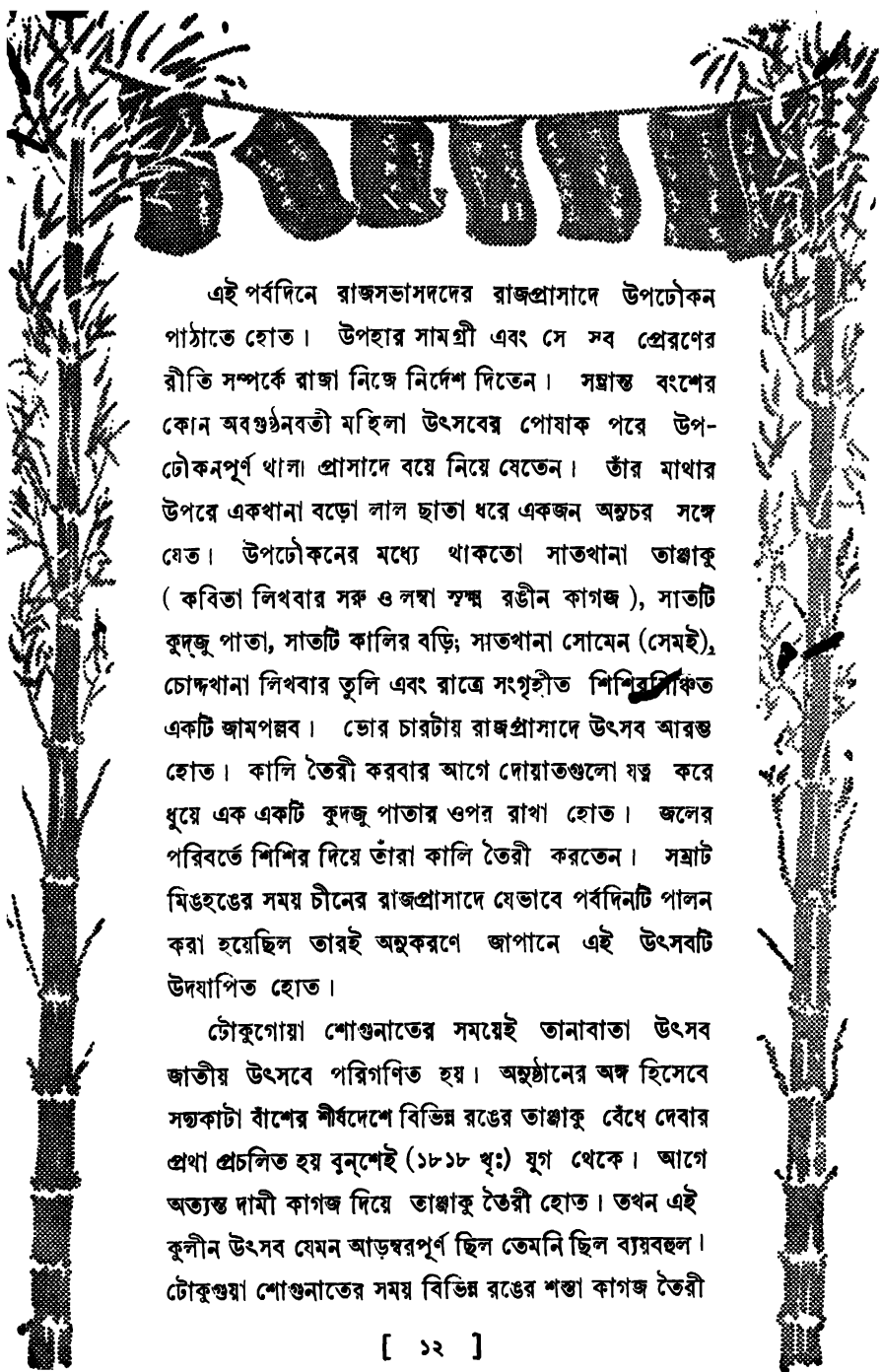
এই পর্বদিনে রাজসভাসদদের রাজপ্রাসাদে উপঢৌকন পাঠাতে হোত। উপহার সামগ্রী এবং সে সব প্রেরণের রীতি সম্পর্কে রাজা নিজে নির্দেশ দিতেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কোন অবগুণ্ঠনবতী মহিলা উৎসবের পোষাক পরে উপঢৌকনপূর্ণ থালা প্রাসাদে বয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁর মাথার উপরে একখানা বড়ো লাল ছাতা ধরে একজন অনুচর সঙ্গে যেত। উপঢৌকনের মধ্যে থাকতো সাতখানা তাঞ্জাকু (কবিতা লিখবার সরু ও লম্বা সূক্ষ্ম রঙীন কাগজ), সাতটি কুদ্‌জু পাতা, সাতটি কালির বড়ি; সাতখানা সোমেন (সেমই), চোদ্দখানা লিখবার তুলি এবং রাত্রে সংগৃহীত শিশিরসিঞ্চিত একটি জামপল্লব। ভোর চারটায় রাজপ্রাসাদে উৎসব আরম্ভ হোত। কালি তৈরী করবার আগে দোয়াতগুলো যত্ন করে ধুয়ে এক একটি কুদজু পাতার ওপর রাখা হোত। জলের পরিবর্তে শিশির দিয়ে তাঁরা কালি তৈরী করতেন। সম্রাট মিঙহুঙের সময় চীনের রাজপ্রাসাদে যেভাবে পর্বদিনটি পালন করা হয়েছিল তারই অনুকরণে জাপানে এই উৎসবটি উদযাপিত হোত।

টোকুগোয়া শোগুনাতের সময়েই তানাবাতা উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিগণিত হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে সদ্যকাটা বাঁশের শীর্ষদেশে বিভিন্ন রঙের তাঞ্জাকু বেঁধে দেবার প্রথা প্রচলিত হয় বুন্‌শেই (১৮১৮ খৃঃ) যুগ থেকে। আগে অত্যন্ত দামী কাগজ দিয়ে তাঞ্জাকু তৈরী হোত। তখন এই কুলীন উৎসব যেমন আড়ম্বরপূর্ণ ছিল তেমনি ছিল ব্যয়বহুল। টোকুগুয়া শোগুনাতের সময় বিভিন্ন রঙের শস্তা কাগজ তৈরী
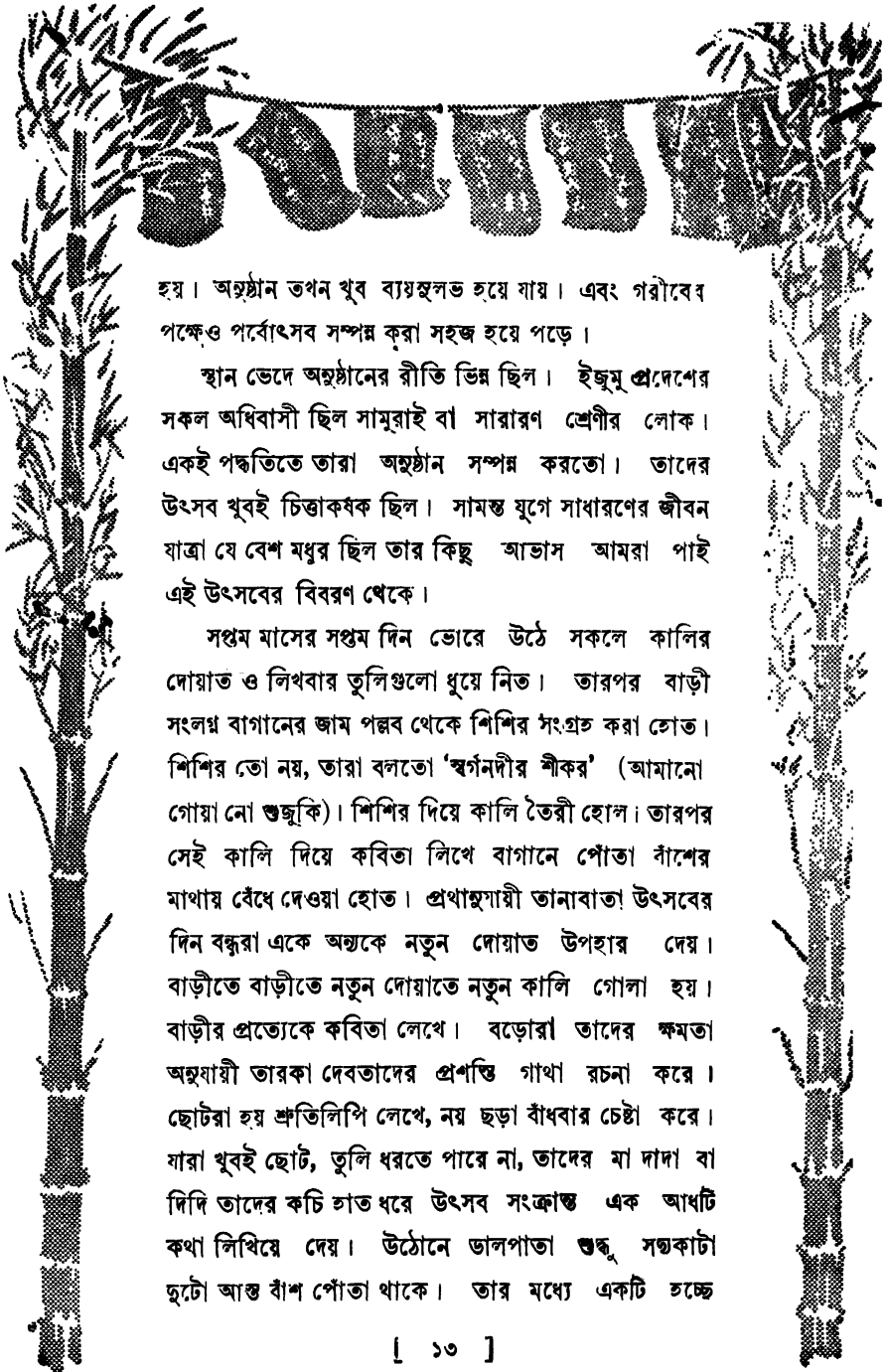
হয়। অনুষ্ঠান তখন খুব ব্যয়সুলভ হয়ে যায়। এবং গরীবের পক্ষেও পর্বোৎসব সম্পন্ন করা সহজ হয়ে পড়ে।

স্থান ভেদে অনুষ্ঠানের রীতি ভিন্ন ছিল। ইজুমু প্রদেশের সকল অধিবাসী ছিল সামুরাই বা সাধারণ শ্রেণীর লোক। একই পদ্ধতিতে তারা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতো। তাদের উৎসব খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। সামন্ত যুগে সাধারণের জীবন যাত্রা যে বেশ মধুর ছিল তার কিছু আভাস আমরা পাই এই উৎসবের বিবরণ থেকে।

সপ্তম মাসের সপ্তম দিন ভোরে উঠে সকলে কালির দোয়াত ও লিখবার তুলিগুলো ধুয়ে নিত। তারপর বাড়ী সংলগ্ন বাগানের জাম পল্লব থেকে শিশির সংগ্রহ করা হোত। শিশির তো নয়, তারা বলতো 'স্বর্গনদীর শীকর' (আমানো গোয়া নো শুজুকি)। শিশির দিয়ে কালি তৈরী হোল। তারপর সেই কালি দিয়ে কবিতা লিখে বাগানে পোঁতা বাঁশের মাথায় বেঁধে দেওয়া হোত। প্রথানুযায়ী তানাবাতা উৎসবের দিন বন্ধুরা একে অন্যকে নতুন দোয়াত উপহার দেয়। বাড়ীতে বাড়ীতে নতুন দোয়াতে নতুন কালি গোলা হয়। বাড়ীর প্রত্যেকে কবিতা লেখে। বড়োরা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী তারকা দেবতাদের প্রশস্তি গাথা রচনা করে। ছোটরা হয় শ্রুতিলিপি লেখে, নয় ছড়া বাঁধবার চেষ্টা করে। যারা খুবই ছোট, তুলি ধরতে পারে না, তাদের মা দাদা বা দিদি তাদের কচি হাত ধরে উৎসব সংক্রান্ত এক আধটি কথা লিখিয়ে দেয়। উঠোনে ডালপাতা শুদ্ধু সদ্যকাটা দুটো আস্ত বাঁশ পোঁতা থাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে
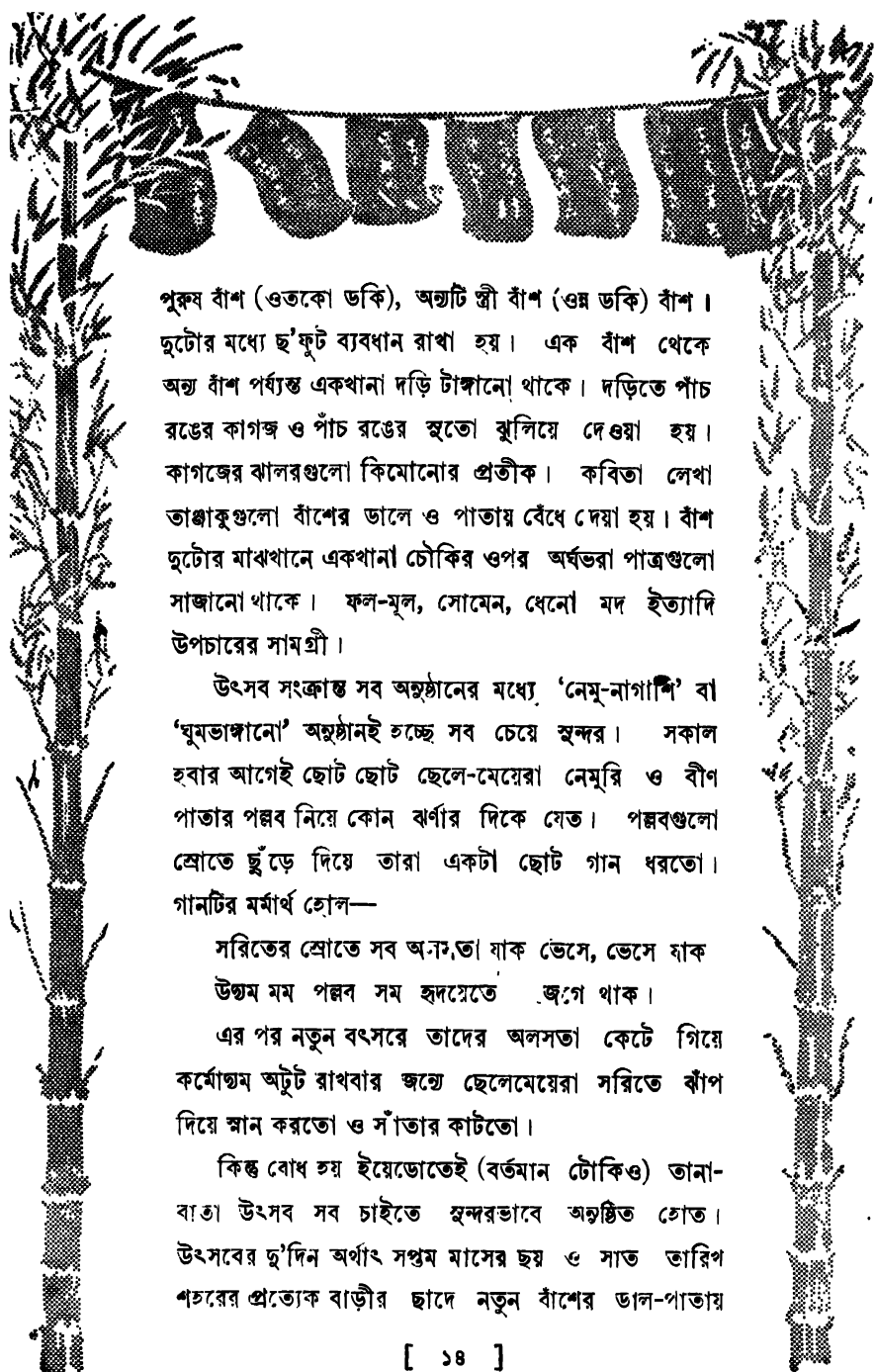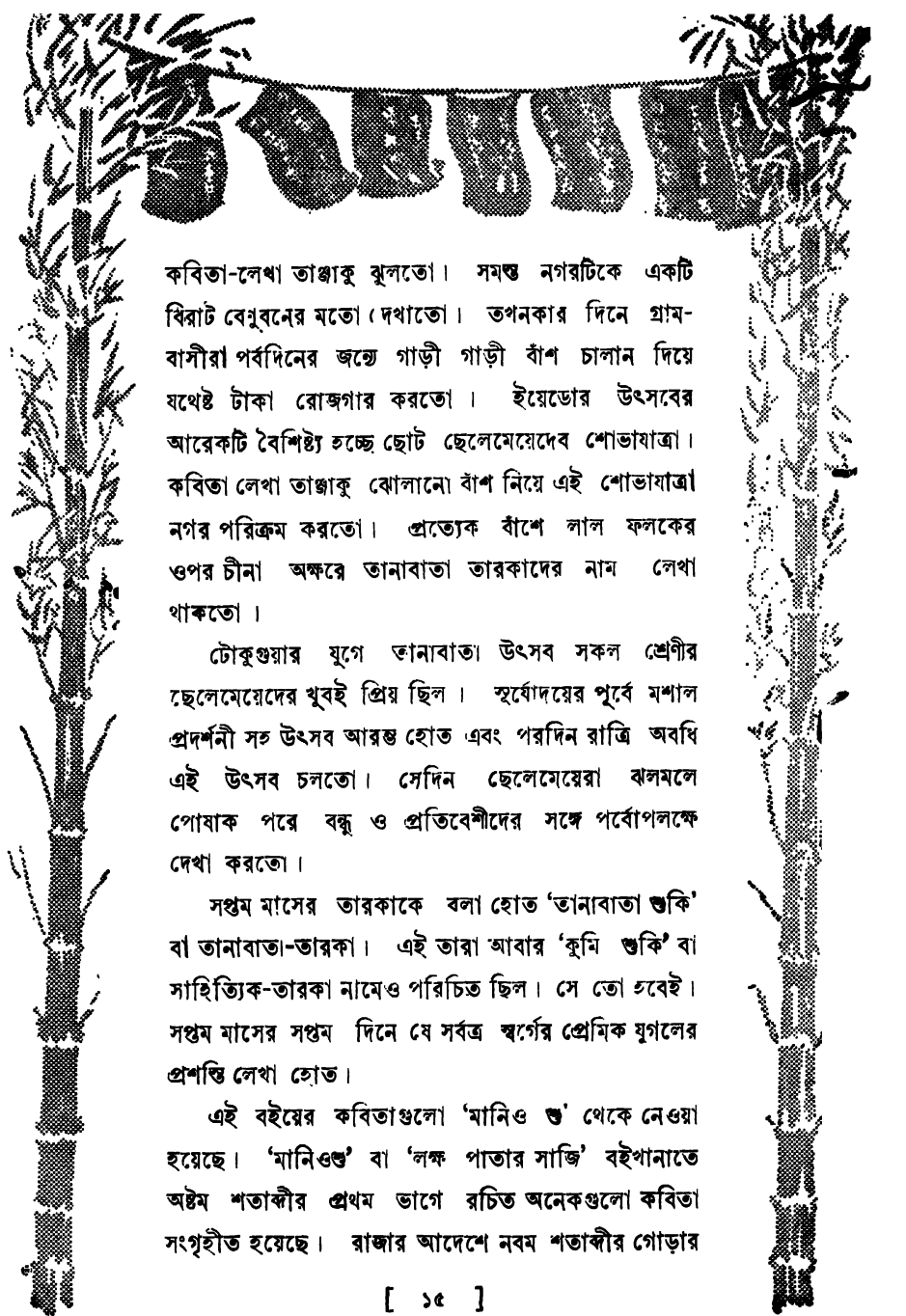
পুরুষ বাঁশ (ওতকো ডকি), অন্যটি স্ত্রী বাঁশ (ওন্ন ডকি) বাঁশ। দুটোর মধ্যে ছ'ফুট ব্যবধান রাখা হয়। এক বাঁশ থেকে অন্য বাঁশ পর্য্যন্ত একখানা দড়ি টাঙ্গানো থাকে। দড়িতে পাঁচ রঙের কাগজ ও পাঁচ রঙের সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাগজের ঝালরগুলো কিমোনোর প্রতীক। কবিতা লেখা তাঞ্জাকুগুলো বাঁশের ডালে ও পাতায় বেঁধে দেয়া হয়। বাঁশ দুটোর মাঝখানে একখানা চৌকির ওপর অর্ঘভরা পাত্রগুলো সাজানো থাকে। ফল-মূল, সোমেন, ধেনো মদ ইত্যাদি উপচারের সামগ্রী।

উৎসব সংক্রান্ত সব অনুষ্ঠানের মধ্যে 'নেমু-নাগাশি' বা 'ঘুমভাঙ্গানো' অনুষ্ঠানই হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর। সকাল হবার আগেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নেমুরি ও বীণ পাতার পল্লব নিয়ে কোন ঝর্ণার দিকে যেত। পল্লবগুলো স্রোতে ছুঁড়ে দিয়ে তারা একটা ছোট গান ধরতো। গানটির মর্মার্থ হোল—

সরিতের স্রোতে সব অলসতা যাক ভেসে, ভেসে যাক
উদ্যম মম পল্লব সম হৃদয়েতে জেগে থাক।

এর পর নতুন বৎসরে তাদের অলসতা কেটে গিয়ে কর্মোদ্যম অটুট রাখবার জন্যে ছেলেমেয়েরা সরিতে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করতো ও সাঁতার কাটতো।

কিন্তু বোধ হয় ইয়েডোতেই (বর্তমান টোকিও) তানাবাতা উৎসব সব চাইতে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হোত। উৎসবের দু'দিন অর্থাৎ সপ্তম মাসের ছয় ও সাত তারিখ শহরের প্রত্যেক বাড়ীর ছাদে নতুন বাঁশের ডাল-পাতায়
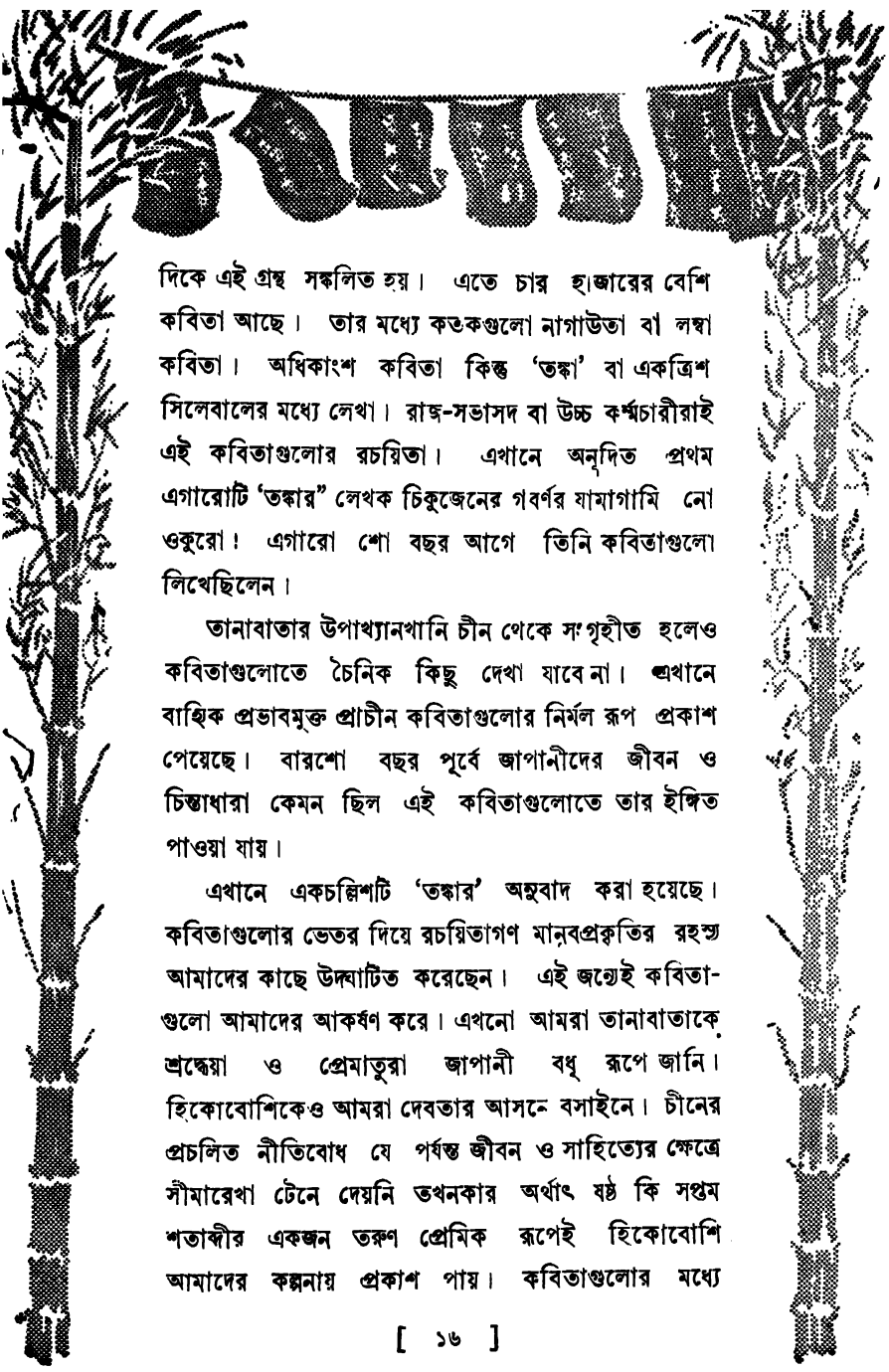
কবিতা-লেখা তাঞ্জাকু ঝুলতো। সমস্ত নগরটিকে একটি বিরাট বেণুবনের মতো দেখাতো। তখনকার দিনে গ্রাম-বাসীরা পর্বদিনের জন্যে গাড়ী গাড়ী বাঁশ চালান দিয়ে যথেষ্ট টাকা রোজগার করতো। ইয়েডোর উৎসবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের শোভাযাত্রা। কবিতা লেখা তাঞ্জাকু ঝোলানো বাঁশ নিয়ে এই শোভাযাত্রা নগর পরিক্রম করতো। প্রত্যেক বাঁশে লাল ফলকের ওপর চীনা অক্ষরে তানাবাতা তারকাদের নাম লেখা থাকতো।

টোকুগুয়ার যুগে তানাবাতা উৎসব সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয় ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে মশাল প্রদর্শনী সহ উৎসব আরম্ভ হোত এবং পরদিন রাত্রি অবধি এই উৎসব চলতো। সেদিন ছেলেমেয়েরা ঝলমলে পোষাক পরে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে পর্বোপলক্ষে দেখা করতো।

সপ্তম মাসের তারকাকে বলা হোত 'তানাবাতা শুকি' বা তানাবাতা-তারকা। এই তারা আবার 'কুমি শুকি' বা সাহিত্যিক-তারকা নামেও পরিচিত ছিল। সে তো হবেই। সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে যে সর্বত্র স্বর্গের প্রেমিক যুগলের প্রশস্তি লেখা হোত।

এই বইয়ের কবিতাগুলো 'মানিও শু' থেকে নেওয়া হয়েছে। 'মানিওশু' বা 'লক্ষ পাতার সাজি' বইখানাতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত অনেকগুলো কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। রাজার আদেশে নবম শতাব্দীর গোড়ার

দিকে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। এতে চার হাজারের বেশি কবিতা আছে। তার মধ্যে কতকগুলো নাগাউতা বা লম্বা কবিতা। অধিকাংশ কবিতা কিন্তু 'তঙ্কা' বা একত্রিশ সিলেবালের মধ্যে লেখা। রাজ-সভাসদ বা উচ্চ কর্ম্মচারীরাই এই কবিতাগুলোর রচয়িতা। এখানে অনূদিত প্রথম এগারোটি 'তঙ্কার" লেখক চিকুজেনের গবর্ণর যামাগামি নো ওকুরো! এগারো শো বছর আগে তিনি কবিতাগুলো লিখেছিলেন।

তানাবাতার উপাখ্যানখানি চীন থেকে সংগৃহীত হলেও কবিতাগুলোতে চৈনিক কিছু দেখা যাবে না। এখানে বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত প্রাচীন কবিতাগুলোর নির্মল রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বারশো বছর পূর্বে জাপানীদের জীবন ও চিন্তাধারা কেমন ছিল এই কবিতাগুলোতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এখানে একচল্লিশটি 'তঙ্কার' অনুবাদ করা হয়েছে। কবিতাগুলোর ভেতর দিয়ে রচয়িতাগণ মানবপ্রকৃতির রহস্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই জন্যেই কবিতাগুলো আমাদের আকর্ষণ করে। এখনো আমরা তানাবাতাকে শ্রদ্ধেয়া ও প্রেমাতুরা জাপানী বধূ রূপে জানি। হিকোবোশিকেও আমরা দেবতার আসনে বসাইনে। চীনের প্রচলিত নীতিবোধ যে পর্যন্ত জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমারেখা টেনে দেয়নি তখনকার অর্থাৎ ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীর একজন তরুণ প্রেমিক রূপেই হিকোবোশি আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পায়। কবিতাগুলোর মধ্যে
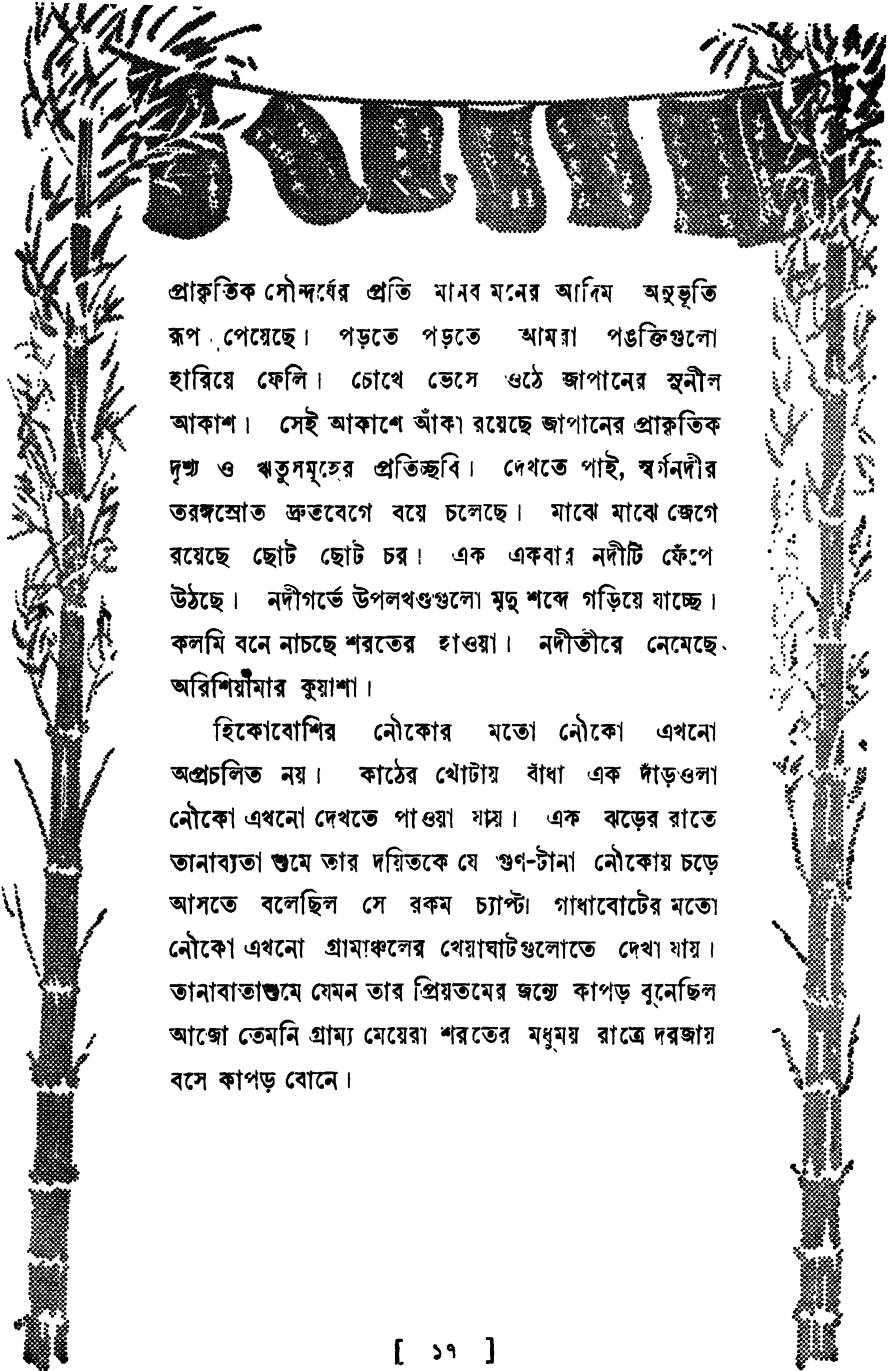
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মানব মনের আদিম অনুভূতি রূপ পেয়েছে। পড়তে পড়তে আমরা পঙক্তিগুলো হারিয়ে ফেলি। চোখে ভেসে ওঠে জাপানের সুনীল আকাশ। সেই আকাশে আঁকা রয়েছে জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঋতুসমূহের প্রতিচ্ছবি। দেখতে পাই, স্বর্গনদীর তরঙ্গস্রোত দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে জেগে রয়েছে ছোট ছোট চর। এক একবার নদীটি ফেঁপে উঠছে। নদীগর্ভে উপলখণ্ডগুলো মৃদু শব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে। কলমি বনে নাচছে শরতের হাওয়া। নদীতীরে নেমেছে অরিশিয়ামার কুয়াশা।

হিকোবোশির নৌকোর মতো নৌকো এখনো অপ্রচলিত নয়। কাঠের খোঁটায় বাঁধা এক দাঁড়ওলা নৌকো এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এক ঝড়ের রাতে তানাবাতা গুমে তার দয়িতকে যে গুণ-টানা নৌকোয় চড়ে আসতে বলেছিল সে রকম চ্যাপ্টা গাধাবোটের মতো নৌকো এখনো গ্রামাঞ্চলের খেয়াঘাটগুলোতে দেখা যায়। তানাবাতাগুমে যেমন তার প্রিয়তমের জন্যে কাপড় বুনেছিল আজো তেমনি গ্রাম্য মেয়েরা শরতের মধুময় রাত্রে দরজায় বসে কাপড় বোনে।

ছায়াপথের রূপকথা

মন্দাকিনীর তীরে বসে পথটি চেয়ে থাকা
সফল হবে, সফল হবে আজ,
পূর্ণ করে দীর্ঘ দিনের অগাধ আকাঙ্ক্ষা
অঙ্গনে মোর আসছে হৃদিরাজ।

বিদায়-বেলা যে মেখলা দিয়েছিল বেঁধে
পারণে আজ প্রিয় তাহা খুলে দেবে সেধে।*

স্বর্গনদীর তীক্ষ্ণ স্রোতে ভাসিয়ে তরীখান
দয়িত আমার আসছে সুনিশ্চয়,
ধন্য হবে জীবন আমার, দীপ্ত হবে প্রাণ,
রজনী আজ হাসবে মধুময়।

ওপারের সমীরণ,
এই ছুটে এসে নিবিড় রভসে দেয় মধু চুম্বন।
এই আকাশের মেঘের মেয়েরা মুক্ত সহজ গতি
ওপারের ঐ আকাশেতে যায় হয় না কাহারো ক্ষতি।
মোর সুদূরের প্রিয়তম সাথে কিন্তু কখনো নয়
যে কোনরূপ অতি সাধারণ দু'টি বাণী-বিনিময়।

এইটুকু নদী হায়,
এপার হইতে উপল ছুঁড়িলে ওপারে পৌঁছে যায়।
অমরাবতীর তীক্ষ্ণ স্রোতটি মোদের করেছে ছিন্ন,
মিলনের আশা বৃথ করি হায় শারদ জোছনা ভিন্ন।

---

* এখানে জাপানের এক মধুর প্রথার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন জাপানী সাহিত্যে এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদায়ের আগে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের কোমড়ে ঘুনসির মতো কিছু বেঁধে দিতএবং পরবর্তী মিলনের পূর্বে এই বন্ধন স্পর্শ করবে না বলে পরস্পরের কাছে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোত।

শারদ সমীর রহিল ভুবনে যবে
মনেতে শুধানু, মিলন কখন হবে ?
বহু বাঞ্ছিত প্রিয়তম হৃদিরাজ
বাহু পাশে মোর আসিতেছে বটে আজ।
স্রোতস্বতীর স্বচ্ছধারা শান্ত বটে আজি,
ঝড়ের তালে উদ্বেলিত নহে উর্মিরাজি।
তবুও এই ছোট্ট নদী পারি না পার হতে,
সুরপতির আদেশ আছে, মিলন শরতে।

নদীতে আজ ঝড় ওঠেনি
তরঙ্গ নেই বটে,
তবুও আমার ওপারেতে
যাওয়া নাহি ঘটে !
ঐ যে আমার আকুল প্রিয়া
বসে শ্যামল তীরে ;
অঙ্গরাখার হাতা দুটি
কাঁপছে ধীরে ধীরে।
এপার থেকে দেখছি সবি,
দেখাই শুধু সার,
শারদ শশীর আলোক বিনে
কি করে হই পার !
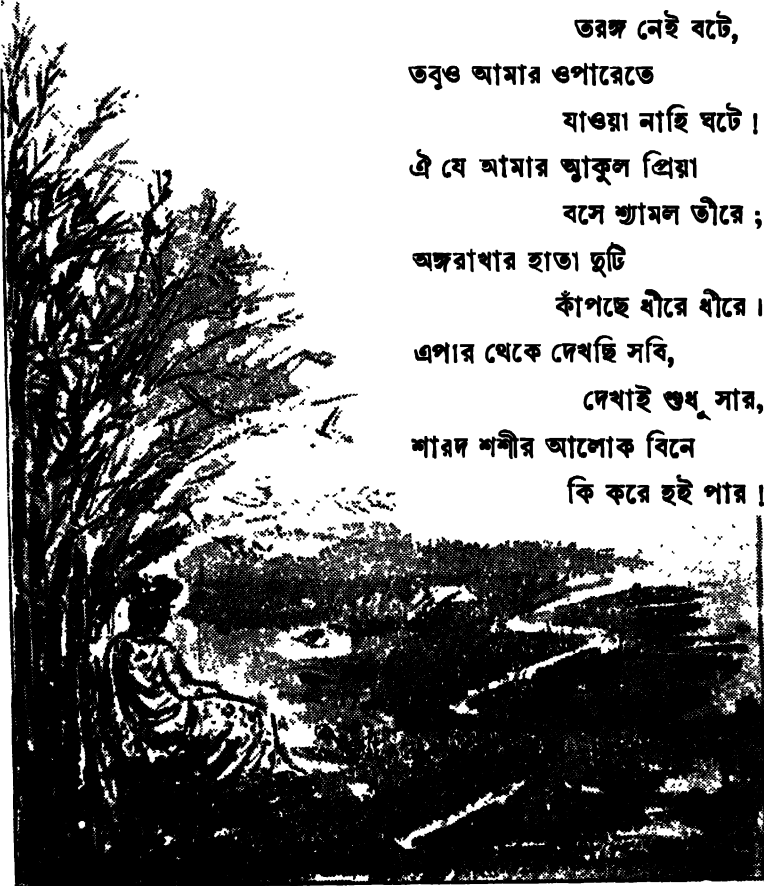
বিদায়ের ক্ষণে পলকের তরে দেখেছিনু বঁধুয়ারে,
পলায়নপরা প্রজাপতি যেন চলে গেল চুপি সারে।
প্রিয়ার মিলন যাচিয়া এখন বৃথাই কাটাই কাল,
বরষ না যেতে কাটিবে না হায় বিরহের কালো জাল।

ছিকোবোশি যাচ্ছে বুঝি প্রিয়া মিলন তরে।
সুরধুনীর শুভ্রস্রোতে বৈঠা টেনে জোরে।
স্বচ্ছ ধারায় তীক্ষ্ণ দাঁড়ের তীব্র আঘাত লেগে
কুঝ্‌ঝটিকার কুহকী জাল উঠেছে তাই জেগে।

স্বরগ নদীর তীরে তীরে
কুহেলিকা রচে মায়াজাল,
প্রিয় আশে সেথা বসে বসে
কাটিয়েছি বৃথা কতো কাল!
সুরধুনী চাপিয়া আঁচল
শুধায়েছে সমবেদনায়,
উদাসিনী হলি কার তরে,
বল্ তোর মন কারে চায়?

স্বর্ণধারার খেয়াঘাটে শুনছি কিসের ধ্বনি
তরুণ প্রেমিক আসছে কি আজ বেয়ে তরণী!
প্রবাহিনীর পেলব বুকে
হানছে আঘাত ধুকে ধুকে,
তরঙ্গিনীর বক্ষেতে তাই জাগে কলরোল,
ব্যাকুল হয়ে আসে প্রিয় হৃদয় উতরোল।

শাসন করিয়া বিলাস বসন
ভানবাতা একা আবেশ মগন
না খুলিতে উষা অবগুণ্ঠণ
তুলোনা তটিনি খর গর্জন
পবনের প্রভাবে,
বিরহ-বিধুর পদ্ম-আঁখির তন্দ্রা টুটিয়া যাবে।

কপট কুয়াসা মন্থর পদে অঞ্চল উড়াইয়া
ঐ পার হতে এই পারে আসে মায়াজাল বিরচিয়া।
হেরিয়া তাহারে চকোরীর প্রাণ
অসীম আশায় গেয়ে ওঠে গান;

প্রেমিক আমার বেয়ে তরীখান
বয়ানে টানিয়া হাসি,
আসিছে আমার অন্তর-দ্বারে
আমারেই ভালোবাসি।

মন্দাকিনীর ঐখানে ওই
'যমুর' খেয়াঘাঠে
তরণী এক ভাসছে দুলে
উর্মিমালার সাথে।
বোলো প্রিয়ার কাণে কাণে,
তারি আশায় এই স্থানে
দুর্বিসহ দিবসগুলি করছি গো যাপন
সে যে আমার হৃদয়মণি
একান্তই আপন।

তারকা-দেবতা আমি, মোর পথে বাধা-বন্ধ নাই,
সীমাহীন আকাশের যেথা খুসি সহজেতে যাই।
তথাপি তোমার লাগি নদী পার হয়ে যেতে আজ
প্রেরণা পাইনে প্রাণে, মনে হয় সুকঠিন কাজ।

আট সহস্র পৃথিবীর বিধি গড়েন যিনি
তাঁহার সেই সত্য যুগ হতে,
লোকচক্ষুর অন্তরালে আসত প্রণয়িণী,
মিলন হোত গুপ্ত ঘন পথে।
মর্মতলের নর্মসাধ বাড়লো অনুখন
রজনী দিন কাঁদে আকাংখা
উদ্বেলতার মুখে টুটে লাজের আবরণ
গোপন কথা রইল নাকো ঢাকা।

এই ধরণীর বক্ষ হতে
বিদায় নিয়ে আপন পথে,
দূর অসীমে চলে গেল যেদিন এ-আসমান
সেদিন থেকে আমার মিতা
হয়েছে মোর পরিণীতা ;
তবু মোদের মিলন পথে এল আদেশ-বান :
সবুর কর শিউলি ফুলের শুভ্র অভিযান।

রঙীন-বদন প্রিয়ার সাথে এই নিশিতে আমি
স্রোতস্বতীর স্নিগ্ধ বুকে যাবোই যাবো নামি ।
সেথায় আছে কঠিন ধবল উপল-উপাধান
শিরটি রেখে তাহার 'পরে রইবো গো শয়ান ।

শরতের মৃদু হাওয়া দেয় যবে দোল,
শাপলার বক্ষেতে জাগে হিল্লোল ।
মনে ভাবি মিলনের হয়েছে সময়,
প্রিয়তম বঁধু মোর আসে নিশ্চয় ।

হঠাৎ যবে পরাণখানি উতল হয়ে ওঠে
আকাশ-পথে মলয় সাথে দয়িত পানে ছোটে ;
তখন কাণে সুরধুণীর কুলুধ্বনি বাজে
ঝপ ঝপাঝপ, বৈঠা শুনি পড়ছে নদী মাঝে ।

মধুর নিশীথে যদি সুদূরের প্রিয়া পাশে সুখেতে শুইয়া কভু থাকি
উভয়ের বাহু 'পরে উভয়ে সোহাগভরে সযতনে শিরখানি রাখি,
ডেকোনা মোরগ বন্ধু গেয়োনা প্রভাতগীতি, কৃপা কোর তৃষিতের প্রতি,
হলেও হোক না ভোর, অরুণ খুলুক দোর, তাহাতে তোমার কিবা ক্ষতি ?

কর 'পরে কর রাখি মুখ 'পরে মুখ
কাটাইয়া দেই যদি লাখ লাখ যুগ,
অনন্ত প্রেমের তবু নাহি হয় ক্ষতি,
(বিচ্ছেদ বিধান তবে কেন বিশ্বপতি !)

আমার তরে তানাবাতা বসে আপন ঘরে
বুনেছিল শুভ্র বসন অতি যতন করে।
এতোদিনে হয়তো বা সেই বসন দিয়ে সে
মনোমোহন পরিচ্ছদ এক তৈরী করেছে।
হোক না প্রিয়া দূরদেশেতে
পাঁচশো মেঘের ওপারেতে
দৃষ্টি যেথায় পথ খুঁজে না পায়;

তবু দিনের অবসানে
প্রিয়তমার কুটির পানে
রইবো চাহি, পরাণ তারে চায়।

শরতের আগমনে—
ঢেউগুলো যবে ঢাকা পড়ে
ঘন কুয়াসার আবরণে,
আশায় আকুল নয়ন যুগল
নদী পানে ছুটে যায়,
এই ভাবে মোর আশার রজনী
কতো না কাটিল হায়
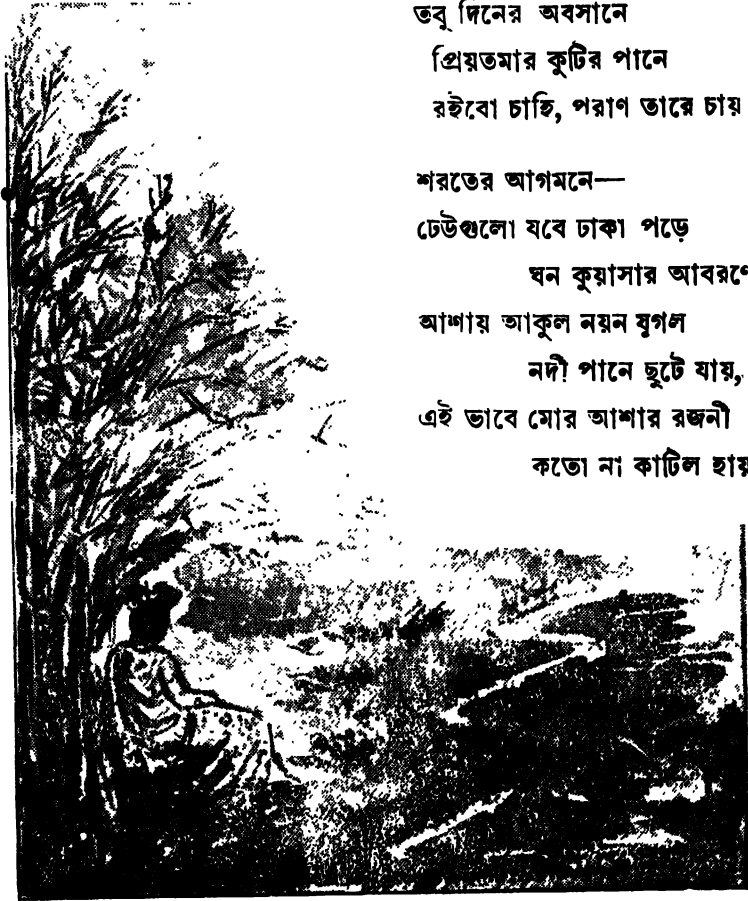
সপ্তম মাসের শুধু সপ্তম যামিনী
আমাদের মিলনের মধু নিশিথিনী।
প্রেমের পিয়াসা তবু মিটিবার আগে
দেখো ভাই, পূবাকাশে অরুণিমা জাগে।

দীর্ঘ বছর কাটিয়ে দিলাম যে আশায় আশায়,
আজ নিশিতে সব কিছু তার ফুরিয়ে গেল হায়!
কাল হতে ফের একা একা আগের দিনের মতো
তারি তরে কাটবে আমার আশার দিবস যতো।

আজ এই শুভ রাতে—
তানাবাতা শুমে মিলিবে তাহার প্রিয় হিকেবোশি সাথে।
শোন ওগো ঢেউ সব,
স্রোতস্বতীর থির বুকে আজি তুলিওনা কলবর।

নীল গগণের তলে,
শারদ হাওয়ার পরশ পেয়ে যে মেঘখানি দোলে,
হবে কি তা দেবদুহিতা তানাবাতা শুমের,
সুশোভনা শ্বেত ওড়না মাথার এবং গলের।

সে তো নহে মোর নিত্য সাথী,
তাই বলি কষে টান দাঁড়,
বড় বেশী না হইতে রাতি
তরি' যেন স্বর্গ-পারাবার।

অমরাবতীর শীতল নদীর নিরমল নীল নীরে,
গভীর নিশিতে কোমল কুয়াসা নেমে আসে অতি ধীরে ;
ছিকোবোশি বুঝি প্রিয়া পানে আসে, তাড়াতাড়ি দাঁড় টানে
দাঁড় টানিবার শব্দটি তার হাওয়ায় বহিয়া আনে।

আসছে আজি ছিকোবোশি হৃদয় উতরোল
তরঙ্গনীর বক্ষে তুলে ক্ষেপণ কলরোল।
স্বর্গনদীর জল বুঝি তাই ছিটকে পড়েছে
বৃষ্টিরূপে আজকে সাঁঝে ধরায় নেমেছে।

কাল হতে পুনরায়,
কাটিবে আমার বিরহ রজনী সেই মতো ওগো হায়।
রতন-শয্যা যতনে গুটিয়ে উপরে তুলিয়া রাখি,
দোসর বিহীন যাপিবো যামিনী তিমিরে নয়ন ঢাকি।

ঝঞ্ঝাবায়ু বহিছে আজ সারা আকাশ ব্যেপে,
স্বর্গনদীর উর্মিরাশি উঠেছে তাই ক্ষেপে,
শোন প্রিয় আজ তোমাকে এই মিনতি করি,
অবিলম্বে এসো যেন গুণ-টানা-না'য় চড়ি।

উঠুক ফুলে স্বর্ণরেখার শত তরঙ্গ,
বৈঠাঘাতে করবো তাদের দীর্ণ বিভঙ্গ।
ক্ষিপ্রহাতে টানবো আমি দীর্ঘ দুটি দাঁড়
রাত্রি প্রহর না পোহাতে পৌঁছে যাবো পার।

বহু দিন হোল তার তরে মোর হয়েছে বসন বয়ন
সে-বসন দিয়ে এই সন্ধ্যায় পোষাকও করেছি সীবন
বল কেন আর তবে,
বসিয়া থাকিতে হবে,
প্রিয়পথপানে কেন অভাগিনী এখনো চাহিয়া রবে ?

স্বরগ-নদীর স্রোতধারা
হয়েছে চঞ্চল ভীষণা,
নদীতীরে নেই কারো সাড়া,
ছিকোবোশি বুঝি এলো না !

ওগো মাঝি বাও ত্বরা বাও
পার করে দাও মোরে দাও।
—মোর স্বামী বছরে দুবার
পারে না যে আসিতে এপার !

প্রথম যেদিন শরতের সমীরণ,
বহিলো পৃথিবী বুকে,
চলিনু সেদিন সচপল দু'চরণ
নদী-চর পানে সুখে
সেই হতে নদী পারে
বরষ বিরহ ভাবে
বসে আছি আমি, বোল ওগো
বোল তারে।

আসছে বুঝি তানাবাতা আমার পানে ধেয়ে
আপন তরী বেয়ে।
দীপ্ত চাঁদের আনন পরে,
হয়তো বা তাই ছায়া পড়ে ;
হেলে-দুলে যাচ্ছে ভেসে মেদুর মেঘের মেয়ে !

—এর পরও বলা হয় যে, প্রাচীন জাপানী কবিরা নক্ষত্রখচিত আকাশে কোনরূপ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাননি।

তানাবাতার উপাখ্যান, তাঁরা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন হয়তো সেই উপাখ্যান পাশ্চাত্য কবিদের অন্তরে অতি ক্ষীণ অনুভূতিরই সঞ্চার করে। তবু কখনো কখনো চন্দ্রোদয়ের পূর্বে নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ নীরব আকাশের বক্ষ থেকে সেই পুরানো কাহিনীর মায়া আমার মনে নেমে আসে,—বিজ্ঞানের স্থূল সত্য আমি ভুলে যাই, ভুলে যাই আকাশের বিপুল ভীষণতা। তখন ছায়াপথকে এমন গ্রহসমষ্টির সমাবেশ বলে মনে হয় না যার লক্ষ লক্ষ সূর্য পৃথিবীর অন্ধকার অভ্যন্তরকে আলোকিত করতে পারে না। ছায়াপথ তখন সেই স্বর্গনদী 'আমানোগোয়া' রূপেই আমার নয়নে প্রতিভাত হয়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই স্বর্গনদীর উজ্জ্বল স্রোত চঞ্চল বেগে বয়ে চলেছে, তীরে তীরে ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াসার জাল। আর শরতের মৃদু দোল লেগে, শাপলার ঝাড়গুলো নুয়ে পড়ছে। আমি দেখতে পাই তারকার তাঁতে বসে শুভ্রবসনা ওরিহিমে কাপড় বুনছে, আর অপর তীরে আখ্যানোক্ত ষাঁড়টি আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে। আমি বুঝতে পারি সেই মাঝির দাঁড় থেকে ছিটকে পড়া জলই শিশির কণা হয়ে এই পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। তখন আমার মনে হয় স্বর্গ অতি নিকটে, স্বর্গ আরামদায়ক উষ্ণ এবং স্বর্গে মানুষের অধিকার আছে। আমার চারিদিকে যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে তা যেন চির স্থির শাশ্বত প্রেমের স্বপ্ন দিয়ে পরিপূর্ণ—এই প্রেম চির ব্যাকুল, চির সবুজ—দেবতাদের অপত্য শাসনে এই প্রেমের তৃষ্ণা চিরকালের জন্য অতৃপ্ত।